Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 190 - 199
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রাণের প্রহরী’ : কাব্যনাটক বনাম গদ্যনাটক

সুভাষ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mondalsubhas91@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Poetric drama, Sunil Gangopadhyay, Praner Prahari, Prose Drama.

Abstract
Sunil Gangopadhyay was one of the greatest writers of the 20th century. He is a poet, playwright, author. He has proved himself in theatre and has achieved success. He has written many stories, poems and humorous works. Among the dramas written by him the notable drama is ‘Praner Prahari’. The play is divided into two parts, the prose and the poetry. The main character of the play, a father Rishi has fought to the death to save his child despite being a doctor by profession. He never gives up on death. He was terrified of losing every moment. Nevertheless, nature has not surrendered to the infallible law that is death. Although all the doctors did not approve of his efforts, he did not hesitate to apply ampoule injections to the child on his deathbed. Where the chance of recovery is half a percent, otherwise death is inevitable. Invisible Death has repeatedly warned the young sage, saying that the sage's defeat is inevitable. Still, he stuck to his task. He brought his son back from the dead, recovering in life. Sothe sage keeps on saying– ‘I am towards life. I'm always on life.’

The dramatist has made various additions and deletions in the play ‘Praner Prahari’ by making it in two types. Although the main story is the same, compared to the poetic drama, the playwright has brought the sub-story and several characters in the prose drama in a new way, which has been formed in our main discussion. The question arises in my mind, why did the poet-dramatist or prose-dramatist go to write the name of ‘protector of life’? Or has the dramatist been able to correctly determine which of the two types of drama is the 'protector of life' and the 'protector of life’? I tried to find it in the article.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

"অনুকরণ করিবার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে নাটকের উৎপত্তি।"[১]

সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা নাটক বিভিন্ন উপাদান, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আপন অঙ্গে অঙ্গীভূত করেছে। আর তার মধ্যে দিয়েই আধুনিক বাংলা নাটক আজ পরিণতির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশ শতক থেকে বাংলা নাটক আজ একুশ শতকে পদার্পণ করেছে। বর্তমানে অনেক আধুনিক নাট্যকার মহাকাব্যাশ্রিত বা পারিবারিক বিষয়কে অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন। এমনই একজন নাট্যকার হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর খুব অল্প বয়স থেকেই নাটক ও থিয়েটারের প্রতি নেশা ছিল। আর তাই তিনি প্রায় আমৃত্যু পর্যন্ত 'বুধসন্ধ্যা' নামক শৌখিন নাট্য সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। প্রসঙ্গত অধ্যাপক মলয় রক্ষিত বলেছেন—

> "নাটক থিয়েটার নিয়ে সুনীলের আগ্রহ ও ভালোবাসা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাগরুক ছিল।"[২]

তাই তিনি বন্ধু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখের প্ররোচনায় নাটক রচনা করেন।

নাট্যকার হিসাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা নাট্যসাহিত্যকে করে তুলেছেন সমৃদ্ধময়। এই নাট্যচর্চা আমাদের বিস্মিত করে। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে একুশটি নাটকের কথা জানা যায়। এই নাটকগুলি গ্রন্থাকারে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে মলয় রক্ষিত ও কাজি তাজউদ্দিনের যুগ্ম সম্পাদনায় আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যনাটক, গদ্যনাটক, শিশু-নাটক ও অনুবাদ নাটক এই কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে আমরা তাঁর সমগ্র নাট্যভাবনাকে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চেয়েছি।

কাব্যনাটক :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মোট নয়টি কাব্যনাটকের কথা জানা যায়। তাঁর প্রথম কাব্য নাটক 'গুহাবাসী' (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ)। একই সময়ে লেখা অপর দুটি কাব্যনাটক হল 'যা চেয়েছি, যা পাবোনা' ও 'জীবন-স্মৃতি'। 'গুহাবাসী' নাটকে দেখানো হয়েছে মুক্ত ও স্বাধীন জীবন। যে জীবন সমস্ত ভুল ভেঙে দিয়ে এক নতুন জীবন দান করে। 'যা চেয়েছি, যা পাবোনা' নাটকে নাট্যকার কবি নামক এক পুরুষ চরিত্রের আখ্যান বর্ণনা করেছেন। 'জীবন-স্মৃতি' নাটকে লেখক চরিত্রটির পূর্ব স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। সুনীলের পরবর্তী কাব্যনাটক 'প্রাণের প্রহরী' (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। এই নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন মৃত্যু অনিবার্য জেনেও এই পৃথিবীতে একজন পিতার অসুস্থ সন্তানকে বাঁচানোর লড়াই। এই কাব্যনাটকটির মাধ্যমে তিনি প্রথম সার্থক নাটক রচনার সূত্রপাত করলেন।

পরবর্তী কাব্যনাটক 'দুই কবি: একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার' (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ)। পদাবলি সাহিত্যের দুই খ্যাতিমান গীতিকার চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নিজ নিজ জীবনের বেদনাকে পরিস্ফুট করেছেন নাটকের মধ্যে। আসলে এই দুই কবির দুঃখের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সাধারণ মানুষের দুঃখকে এক করে দেখাতে চেয়েছেন নাট্যকার।

'রাজসভায় মাধবী' (১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যনাটকটি একটি সংলাপ কাব্য। সঠিক বিচারের প্রত্যাশায় মাধবী ও তার ভাই কঙ্ক লক্ষণ সেনের রাজসভায় উপস্থিত হয়। রাজার কাছে মাধবীর প্রশ্ন —

"রমণীর অধিকার আছে কি না সসম্মান জীবন যাপনে..."[৩]

অর্থাৎ নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার প্রশ্ন তোলে। রাজা বিচারে অপরাধী শ্রীমান কুমার দত্তকে কঠোর শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিলে মাধবী কুমার দত্তের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে তাকে বনবাসে পাঠাতে আর্জি জানায়। মাধবীর এই করুণা নাটকে শাশ্বত হয়ে রয়েছে।

'নন্দনকাননে দ্রৌপদী' (১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী কাব্যনাটকটি মহাভারতের প্রেক্ষাপটে রচিত। যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, কর্ণ, দুর্যোধন মহাভারতের পৌরাণিক চরিত্র হলেও তা নাট্যকারের সৃজনীশক্তিতে মানবিক হয়ে উঠেছে। তারা স্বর্গে থাকলেও মর্তের কাম-ক্রোধ-ঘৃণা কিছুই ত্যাগ করতে পারেনি। তাই দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে দেবত্বে উন্নীত হওয়ার কথা জানালে যুধিষ্ঠির অনায়াসে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং জানায় —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

" ...আমাকে মানুষ হয়ে বাঁচতে দাও
মানুষ, মানুষ!"[৪]

'দুর্বোধ্য' (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী কাব্যনাটক। এটি কবিতার আঙ্গিকে লেখা। এক ক্ষুধার্ত মানুষকে দুর্বোধ্য বলে মনে করেছেন নাট্যকার তাঁর নাটকে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ কাব্যনাটক 'এক আশ্রমে রক্তপাত' (২০০৬ খ্রিস্টাব্দ) রামায়ণ থেকে মূলত নাট্যকাহিনির প্রেক্ষাপটটি গৃহীত। নাটকটিতে জাবালি পিতৃ-মাতৃহীন কন্যাকে রামচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। যদিও সে জানে তা অসম্ভব। নিরপরাধী শম্বুককে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে রামচন্দ্রের হত্যা করার কথা রয়েছে নাটকটিতে।

গদ্যনাটক :

কাব্যনাটকের সঙ্গে সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একাধিক গদ্যনাটক রচনা করেছেন। তাঁর মোট দশটি গদ্যনাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম গদ্যনাটক 'প্রাণের প্রহরী' (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ)। নাটকটিতে ঋষির মেয়ে ঝুমপুর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মেয়েকে বাঁচাতে তার এক ঝুঁকিপূর্ণ প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী গদ্যনাটক 'রাজারানী' (১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) একটি কমেডিধর্মী নাটক। খ্যাতনামা অভিনেতা জীবনলাল ও তার সুন্দরী স্ত্রী স্বপ্নাকুমারীকে অবলম্বন করে নাট্যঘটনা আবর্তিত হয়েছে। নাটকটি দুটি অঙ্ক ও চারটি দৃশ্যে গঠিত। স্বপ্নাকুমারীর প্রতি পুরুষদের আকর্ষণ যেমন এ নাটকে বিদ্যমান, তেমনি জীবনলালের হঠাৎ করে নিজেকে স্বয়ং রাজা বলে মনে হয়। রাজা হয়ে জীবনলালের সুন্দরী স্ত্রীকে ভুলে দাসী ক্ষীরিকে রানী মনে হওয়া সত্যিই কৌতুকবোধ জাগ্রত করে। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠে।

'ঘন কালো মেঘ' (১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ) নাটকে এক ধনী পরিবারের বিবৃতি রয়েছে। এই পরিবারের সন্তান তন্ময় সিংহ রায়। সে তার জন্মরহস্য জানবার চেষ্টা করে এবং জানতেও পারে। এখানেই নাটকের নাটকীয়তা চমকপ্রদ ভাবে ধরা পড়েছে। সে জন্মেছে তার মায়ের গুরুদেবের স্পার্ম দ্বারা যা তার পিতামাতা বিষয়টি নিয়ে গোপন রেখেছে। আর এই সত্যকেই নাট্যকার 'ঘন কালো মেঘ' বলেছেন। আসলে আমরা সামনে যা দেখি তা আপেক্ষিক সত্য হতে পারে কিন্তু তার আড়ালে অন্য এক গাঢ় সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে। আর তাই তন্ময় অস্তিত্ব সংকটে বাবা মা আর নিজের সম্পর্কের মধ্যে এক বিরাট মিথ্যার অস্তিত্ব আছে তা অনুধাবন করতে পারলেও সেই সত্য সে জানতে চায় না, আর তাই সে চেঁচিয়ে বলে—

"না, না, না, আমি জানতে চাই না, জানতে চাই না, জানতে চাই না!"[৫]

নাট্যকারের পরবর্তী গদ্যনাটক 'লেখকের মুখোমুখি' (২০০৪ খ্রিস্টাব্দ) নাট্যঘটনাটি আবর্তিত হয়েছে মহাভারতের লেখক বেদব্যাসকে কেন্দ্র করে। লেখক বেদব্যাসের মুখোমুখি হয়েছে নাটকে সমরজিৎ-এর মত চরিত্ররা। বেদব্যাস 'মহাভারত' মহাকাব্যটিকে রামায়ণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ দাবী করে 'রামায়ণ' প্রসঙ্গে জানিয়েছে —

"কিন্তু গল্পটা কাঁচা কিনা বলো। যতসব বানর আর রাক্ষস।"[৬]

পরিশেষে দেখা যায় বেদব্যাস রামরাজত্বকে উপেক্ষা করে তাঁর রচিত 'মহাভারত'কে মানুষের মধ্যে যাতে বেশি করে পৌঁছে যায় তার জন্য ধ্যানস্থ হতে।

চারটি দৃশ্যে সমাপ্ত নাট্যকারের পরবর্তী নাটক 'বাসবীর স্বপ্ন' (২০০৪ খ্রিস্টাব্দ)। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের বৈঠকখানায় নাট্যকাহিনির সূচনা হয়েছে। এই পরিবারের কর্ত্রী জয়ন্তী। জয়ন্তীর দিদির মেয়ে বাসবী বাংলাদেশ থেকে এই পরিবারে আসে। তবে তাকে বাংলাদেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই বাড়িতে এসে সে অশোক নামে একটি গাছকে খুব পছন্দ করে। এই গাছটিকে ঘিরে তার স্বপ্ন আবর্তিত হয়েছে —

"আমার একটা স্বপ্ন আছে
অশোকগাছ, তুমি শুধু জানো সেই স্বপ্নের কথা..."[৭]

কিন্তু গাছটি এক ঝড়ের রাতে গায়েব হয়ে যায়। আর বাসবীও একই দিনে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আসলে বাসবীর মনে দেশভাগের এক বেদনা বিরাজ করেছে। সে এই পরিবার বা নতুন দেশে এসে শান্তি পায়নি। তার চিত্তে বিরাজ করেছে দেশত্যাগ করার ট্র্যাজিক স্মৃতিরেখা, তাই তার আর্তনাদ —

“আমার ফিরে যেতে ইচ্ছা করে
আমায় কেন ফিরে যেতে দেবে না
আমায় কেন নির্বাসনে পাঠালে
আমায় কেন, কেন কেন”[৮]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের নারীলোলুপতা ও মেয়েদের মর্যাদা রক্ষার কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে নাট্যকারের পরবর্তী গদ্যনাটক ‘অভিনয় প্রতিভা’ (২০০৫ খ্রিস্টাব্দ)। সর্বজিৎ-এর দীপ্তির সাথে প্রেম হয় ও তার পরিণতি বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবুও সর্বজিৎ দীপ্তির যোগ্যবোন মায়া ও ছোটবোন গার্গীর সঙ্গে অসভ্য আচরণ করে। এমন সর্বজিৎকে শাস্তি দেয় তিনবোনে মিলে এস.ডি.ও নমিতার প্ল্যানমাফিক সহযোগিতায়।

‘তিনশো বছরের কলকাতা’ (২০১০ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী গদ্যনাটক। এই নাটকে কলকাতা শহরের তিনশো বছরের পূর্ব ইতিহাস সুনিপুণ দক্ষতার সাথে নাট্যকার সংক্ষিপ্তভাবে পরিস্ফুট করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তী গদ্যনাটক ‘তিনজন অমর’ (২০১১ খ্রিস্টাব্দ)। নাটকটিতে মহাভারতের রচনাকার বেদব্যাস, অশ্বত্থামা এবং রামায়ণের বিভীষণ এই তিনজনকে কেন্দ্র করে নাটকটির কাহিনি বিবৃত হয়েছে। মহাভারত না রামায়ণ কোনটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ? তা নিয়ে তাদের অর্ন্তদ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে যা হাসির উদ্রেক করে। যেমন- রামায়ণের নিন্দাপ্রসঙ্গে অশ্বত্থামাকে বিভীষণ জানায়—

“রামায়ণের নিন্দা করলে এক চড় মারবো।”[৯]

নাট্যকার সুনীল মহাকাব্যিক চরিত্রগুলিকে অত্যন্ত লঘু করে দেখিয়েছেন।

‘বিচারের বানী’ (২০১১ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী গদ্যনাটক নাট্যকারের। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় অপরাধকারী শিবেন অধিকারী নামে এক ডাকাতের ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সে আশ্রয় নেয় মৌলিনাথের বাড়ি। ডাক্তার চিকিৎসা করতে এসে শিবেনকে সহজেই চিনতে পারে। ডাক্তারের ছোট বোনের বিয়েতে বিয়ে বাড়ির সর্বস্ব লুঠ থেকে শুরু করে দুই বোনকে ধর্ষণ পর্যন্ত করে শিবেন। নাটকের শেষ অংশে শিবেনের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়ে মালা জানিয়েছে —

“পুলিশ তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে, আদালতে তোমার শাস্তি না হতে পারে, তবুও শাস্তি তোমায় পেতেই হবে।”[১০]

নাট্যকারের শেষ গদ্য নাটক ‘পাথরের স্মৃতির চোখ’ (২০১২ খ্রিস্টাব্দ)। এই নাটকে চার দস্যুর চুরি করা ও তার ফলস্বরূপ তাদের ভয়ংকর পরিণতি প্রতিফলিত হয়েছে।

ছোটদের নাটক :

ছোটদের নাটক হিসাবে নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন মাত্র দুটি নাটক। যথা— ‘মালঞ্চমালা’ (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) ও ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী’ (১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ)।

‘মালঞ্চমালা’ নাটকটি কল্পনার বুননে নির্মিত। নাটকটিতে অপুত্রক রাজারানীর দেবতার কৃপায় সন্তান লাভ হয়। কিন্তু বারো দিনের মাথায় সন্তানের মৃত্যু হলে পুত্রবধূ মালঞ্চমালাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেয় রাজা। তবে নানা প্রতিকূলতাকে সামলে দেবতাদের আশীর্বাদে রাজপুত্র চন্দ্রমানিক জীবিত হয় আর নিজ সেবায় তাকে বড় করে তোলে মালঞ্চমালা। পরিশেষে বনদেবীর কৃপায় স্বামীকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রানী হয়ে সুখে বাস করে। ছোটদের নাটক হিসাবে ‘মালঞ্চমালা’ নাটকটি যথার্থ।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী' নাটকটিতে নাট্যকার কথক চরিত্রের অবতারণাকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ব ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। নাটকটিতে কাহিনি শুরু হয়েছে ১৬ই জানুয়ারি ১৯৪১ সালের ঘটনা দিয়ে আর শেষ হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা ওড়ানোর মধ্যে দিয়ে। মূলত নাটকটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অনূদিত নাটক :

শেক্সপিয়রের দুটি পরিচিত নাটক বাংলা ভাষায় আংশিক অনুবাদ করেন নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যথা— 'হ্যামলেট' (প্রারম্ভিক অংশ) ও 'রোমিও জুলিয়েট' (অসম্পূর্ণ অনুবাদ)।

নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মের এক উল্লেখযোগ্য ফসল 'প্রাণের প্রহরী' নাটক। নাটকটিকে নাট্যকার কাব্যনাটক ও গদ্যনাটক এই দ্বিবিধ প্রকরণেই রূপ দেন। যদিও মূল কাহিনি উক্ত প্রকরণ দুটিতে একই। মনে প্রশ্ন জাগে 'প্রাণের প্রহরী' নামে কাব্যনাটক বা গদ্যনাটক নাট্যকার লিখতে গেলেন কেন? অথবা 'প্রাণের প্রহরী' কাব্যনাট্য ও 'প্রাণের প্রহরী' গদ্যনাট্য উভয়ের মধ্যে কোন নাট্য প্রকরণটি নাট্যকার সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পেরেছেন? এটি নির্ণয়ের পূর্বে জেনে নেওয়া যাক, দুটি প্রকরণে নাট্যকারের নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য। আসল 'প্রাণের প্রহরী' কাব্য নাটকটি নাট্যকার আকাশবাণীতে অভিনয়ের জন্য কবিতা সিংহের অনুরোধে লেখেন। নাটকটি লেখার পর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে হতে থাকে —

> "অমন হুড়োহুড়ি করে এবং অত সংক্ষেপে লিখে আমি ওই বিষয়বস্তু সুব্যবহার করতে পারিনি।"[১১]

তাই তিনি এই নাটকটিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্যে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। সময়ের অগ্রগতিতে তিনি রূপ দিলেন নাটকটির গদ্যরূপ। বলা বাহুল্য নাটকটির নাম 'প্রাণের প্রহরী' যা মূলত গদ্যনাটক। গদ্যনাটকটির রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাট্যকার সুনীল জানান —

> "মাঝখানে একবার ট্রেনে একলা কুচবিহার যাবার পথে আমার কল্পনায় ওই নাট্যবিষয়ের চারপাশে আরও অনেক চরিত্র ঘুরঘুর করতে থাকে। যেন একটি বৃহত্তর পরিসর দাবি করে। সেই জন্যই ওই নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গদ্য নাটক রচনা করেছি। দু'- এক বছর বাদে।"[১২]

কাব্যনাট্যে 'প্রাণের প্রহরী' :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পরিচয় তিনি একজন কবি। পরে ঔপন্যাসি তথা গল্পকার, আরও পরে নাট্যকার। তাই কাব্যনাট্যকার হিসাবে তিনি যে যথার্থ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ যথার্থ কাব্যনাট্যকার কে হবেন? তার মূল্যায়ন করেছেন নাট্যসমালোচক ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় —

> "সাধারণত দেখা যায় কাব্যনাট্য রচনায় সেইসব নাট্যকারই সফল যারা মূলত কবি। কবি দৃষ্টি সহজাত না হলে নাটককে সকল দিক থেকে নিখুঁত কাব্যগুণোপেত করা যায় না। আবার শুধুমাত্র কবি দৃষ্টিই তাঁদের থাকলে চলবে না। যেহেতু কাব্যনাটক নাটকও, তাই নাট্যলক্ষণ বা নাটকীয়তা সম্পর্কেও তাঁর বোধ স্বচ্ছ থাকা প্রয়োজন।"[১৩]

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে কাব্যনাট্য কী? উত্তরে বলা যায় কাব্যিক সংলাপে লেখা নাটকই কাব্যনাট্য। অর্থাৎ এ ধরণের নাটক কাব্যগুণমণ্ডিত। এই কাব্যগুণ নাট্যগুণের থেকে বেশি নয় বরং কমই, তবে তা কোনো সময় নাট্যগুণের সমপরিমাণধর্মীও হতে পারে। কাব্যনাট্যকে ইংরেজি পরিভাষায় Poetic Drama বলা হয়ে থাকে। কাব্যনাট্য রচনায় কাব্যনাট্যকারকে আরও কিছু বিষয় জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে সমালোচক তরুণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কাব্যনাট্যকারকে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকের কথাও মনে রাখতে হবে। কাব্য ব্যবহারের মাধ্যমে অলস রোমান্টিকতা প্রকাশ নয়, বরং মনের অতলে যে Intense felling and emotion আছে তাকেই প্রকাশ করা দরকার। কাব্য যেন 'আবেগের বেগে' নাটককে ক্ষুণ্ণ না করে।"[১৪]

কাব্যনাটকে কাহিনি হবে এমন যেখানে ঘটনার ঘনঘটা থাকবে না। মূলত কাব্যনাটক কাব্য ও নাটক উভয়ের ভাব ব্যক্ত করে। কাব্যনাট্যকার হিসাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'প্রাণের প্রহরী' (১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যনাটকটি। সুতরাং কাব্যনাটক হিসাবে নাটকটি কতখানি সংগত তা বিচার করা যেতে পারে। নাটকের লক্ষণ হিসাবে অভিনয় যোগ্যতা, দৃশ্যতা, মঞ্চ, সংলাপ ও চরিত্রকে যদি নাটকের লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যায় তবে এ নাটকে তা সবই উপস্থিত। এক অসুস্থ সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পিতার লড়াই আলোচ্য এই নাটকের বিষয়বস্তু। যেখানে আছে স্নেহ আর কর্তব্যের দ্বন্দ্ব।

'প্রাণের প্রহরী' কাব্যনাটকটিতে আছে দুটি দৃশ্য। একজন দক্ষ নাট্যকার রূপেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দুটি দৃশ্যের শুরুতেই মঞ্চ সজ্জার নির্দেশ দিয়েছেন। নাটকের প্রথম দৃশ্যে সন্ধ্যা বেলায় ডাক্তারের দুই বন্ধু প্রতীক ও সংবরণ ডাক্তারের প্রতীক্ষায় বসে থাকে। আমোদ প্রমোদের জন্য ঋষির ব্যগ্রতা। তাই ডাক্তার ঋষি বলেছে –

> "আটটার পর সব সুখের ছুটি। আমি নেই দরজা বন্ধ কর, এখন আনন্দ হবে, ফুর্তি হবে..."[১৫]

আসলে তার এই আনন্দ পারিবারিক ও মানসিক চিন্তা থেকে কিছুটা সময়ের জন্য মুক্তি। কেননা তার একমাত্র সন্তান বাবলুর অসুস্থতাজনিত উৎকণ্ঠা ও বেদনা যা তাকে পুরোপুরি বিধ্বস্থ করে রাখে। একটি ছায়া যেন তার স্নেহের উৎকণ্ঠাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আর এখানেই নাটকীয়তা যা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাট্য ঘটনার পরতে পরতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই নারীরূপী ছায়া যখনই ঋষির মনে উদিত হয়েছে তখনই ডাক্তার ঋষিকেশ আনন্দ ফূর্তির পরিবেশ থেকে অন্য এক অবাস্তব জগতে চলে যায়। সন্তানের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলতে থাকে নাটকের মধ্যে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নিজের হাতে ছেলেকে প্রায় হত্যা করার মতই নতুন ওষুধ প্রয়োগ করতে আসেন ডাক্তার ঋষি। সেই সময় পিতা ও পুত্রের সংলাপের মধ্যে মূল্যবান জীবনের টানাপোড়েনের প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায় –

> "বাবলু : ভীষণ যন্ত্রণা, বাবা তুমি হাত ধরে নিয়ে যাও
> আমাকে অনেক দূরে এমন কোথাও
> যেখানে একটুও ব্যথা নেই-
> ঋষি : এই দ্যাখ, আমার ডান হাতে ছুরি, আমি
> চোখের নিমিষে
> তোকে নিয়ে যাব সব যন্ত্রণার শেষে
> এক শান্ত অন্য দেশে।"[১৬]

ঠিক এমনই প্রশ্নোত্তর পাই মৃত্যুর সংলাপে –

> "আমি এই শিশুটিকে কালের সীমানা ভেঙে শুধু অসীমে পাঠাব।"[১৭]

স্নেহ, যন্ত্রণা, দ্বন্দ্ব সবকিছুকে অবলম্বন করে নাটকে যে নাটকীয়তা প্রস্ফুটিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না আবার একই সাথে কাব্যগুণ বিরাজমান।

ঋষি ডাক্তার হলেও তার মধ্যে রয়েছে পিতৃসত্তা। তাই সন্তান হারানোর ভয়ার্ত চিত্তে পিতৃ হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। তবে তার মধ্যে রয়েছে হার না মানতে চাওয়ার মানসিকতা। সন্তানের মৃত্যু অনিবার্য জেনেও প্রাণের প্রহরী রূপে ঋষি শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করেছেন। আর তাই দৃপ্ত কণ্ঠে মৃত্যুকে বলেছেন –

> "খেলতে এসেছি তাই আমি জানি খেলার নিয়ম,
> হারজিত আছে।"[১৮]

মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের মধ্যে একটি ভয়-ভীতি কাজ করে আর তাকে নিয়ে নানা ভাবনা আসে। কিন্তু নাট্যকার নাটকে মৃত্যুকে উপস্থাপন করেছেন নারীরূপা এক অদ্ভুত কল্পনায়। যার মধ্যেও অনুশোচনা দেখা দেয়। প্রত্যেক মৃত্যুর মধ্যেও সে

আপেক্ষিক অর্থে সুখী মনে হলেও সে আসলে একাকী ও সুখশুন্য নারী। তাই ঋষি মৃত্যুকে সুখী বলে ধিক্কৃত করলে মৃত্যু জানায় —

"সুখী নই, সুখী নই
যতবার জিতে যাই ততবার মনে মনে হারি
অনন্ত কালের মধ্যে
আমি এক সুখশুন্য নারী।"[১৯]

প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যু ঘটে এটা স্বাভাবিক কিন্তু মৃত্যুর মধ্যেও যে এমন 'বোধ' থাকে তা হয়ত নাট্যকার আমাদের জানাতে দ্বিধাবোধ করেননি। জীবন ও মৃত্যুর এই খেলায় কেউ পরাজয় স্বীকার করতে নারাজ। মৃত্যুর এই পরাজয় ও ঋষির পরাজয় যেন এক হয়ে আমাদের সামনে ধরা দেয় যা নাট্যকার কাব্যের আশ্রয়ে শিল্পরূপ দিয়েছেন।

নাট্যকার এই নাটকে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি বেশ কিছু অপ্রধান চরিত্রের নির্মাণ করেছেন। এই চরিত্র সৃষ্টি নাটকের প্রধান উপাদান। আবার চরিত্র অনুযায়ী শব্দচয়ন ও ভাষা ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূল কাহিনির বাস্তবতা রূপায়নে সংলাপ ব্যবহারে যেমন নাটকীয়তা এনেছেন তেমনি মনের গভীর আবেগকে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কাব্য ও নাটক উভয়ের পরিপূর্ণতায় 'প্রাণের প্রহরী' শুধু কাব্য নয়, নাটকও বটে।

গদ্যনাট্যে 'প্রাণের প্রহরী' :

বাংলা নাট্যচর্চায় নাট্যকারেরা কাব্যনাটকের পাশাপাশি গদ্যনাটকও রচনা করা থাকেন। গদ্যনাটক গঠনগত দিক থেকে কাব্য নাটকের থেকে পৃথক। গদ্যনাটকে মূল কাহিনির পাশাপাশি একাধিক উপকাহিনি থাকতে পারে। আবার থাকতে পারে অসংখ্য চরিত্র। আসলে গদ্য ভাষায় লেখা নাটকই গদ্যনাটক। গদ্যনাটকের নাট্যকার কবিতার মাধুর্যকে দূরে সরিয়ে গদ্য সংলাপের আদলে শিল্পরূপ দেন। গদ্যনাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে সমালোচক ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়, তিনি জানান —

> "অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় সমাজ মানসে ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার নানা পরিবর্তন দেখা দিল। যুক্তি ও গদ্যের যুগ এল। পুরো শতাব্দী জুড়েই মনন শক্তির প্রভুত্ব ও গদ্যের একাধিপত্য চলল। নাটকেও পদ্যভাষায় পরিবর্তে গদ্যভাষায় দাবী এল।"[২০]

এরপরেই উনিশ শতকে জর্জ বার্নাড শ', জন গলর্সওয়ার্দি প্রমুখ নাট্যকাররা তাঁদের নাটকে পদ্যভাষার পরিবর্তে গদ্যভাষা ব্যবহার করলেন। পাশ্চাত্য নাট্যকারদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রানিত হয়ে একাধিক নাট্যকারগন বাংলা নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এমন নাট্যকারদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম।

নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গদ্যভাষার আদলে রচনা করলেন তাঁর প্রথম গদ্যনাটক 'প্রাণের প্রহরী'। ঋষিকেশ তথা ঋষির পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করে এই নাটকটি নির্মিত হয়েছে। ডাক্তার ঋষির কর্তব্যবোধ একদিকে যেমন আছে তেমনি অন্যদিকে আছে পিতার স্নেহ ও ভালোবাসা।

নাটকের শুরুতেই অতীন ও সংবরণ নামে দুই বন্ধু ঋষির জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের উদ্দেশ্য একঘেয়েমি জীবন থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে বন্ধু ঋষির সঙ্গে আড্ডা দেওয়া। এরপর নাট্যঘটনা যত অগ্রসর হয়েছে তত নাট্যকাহিনিকে নাট্যকার নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। ঋষি যখন আর্টিস্ট প্রভাস সরকারকে বাঁচানোর জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে স্ত্রী প্রতিমাকে জানায় —

> "মৃত্যুর সঙ্গে আমার চ্যালেঞ্জ। প্রভাস সরকারকে আমি বাঁচিয়ে তুলবই।"[২১]

আমাদের তখন বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না নাট্যকার একদিকে যেমন ডাক্তার ঋষির কর্তব্যবোধের পরিচয়কে পরিস্ফুট করেছেন, আবার অন্যদিকে ঋষির একজন পিতারূপে নিজের সন্তানকে বাঁচাবার তাগিদ দেখা গেছে। নাটকের প্রতি মুহূর্তে রয়েছে ঋষির মৃত্যুর কাছে হার না মানার এক অদম্য জেদ, যা নাট্যকার শিল্পরূপ দিয়েছেন নাটকে।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নাটকের প্রধান কাহিনির প্রেক্ষাপটটিকে নাটকীয়তার চমৎকারিত্বে অভিনব করে তুলতে অত্যন্ত উপাদেয় হয়ে উঠেছে এই দৃশ্যটি। দেখা গেছে ডাক্তার সত্তা পিতৃসত্তার কাছে হেরে গেছে। সন্তান হারানোর ভয়ে পিতৃহৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত। পিতা ঋষি বিচলিত হয়ে ভণ্ড অঘোর বাবার কাছে মেয়ের চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করে। অসহায় পিতার এই অনুরোধ খুবই মর্মস্পর্শী —

"আপনার অলৌকিক শক্তি আছে? আপনি আমার মেয়েকে..."[২২]

বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না ভণ্ড অঘোর বাবার কাছে পিতৃসত্তা সমর্পিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যের মাধ্যমে 'প্রাণের প্রহরী' গদ্য নাটকটির মূল কাহিনিকে তরান্বিত করেছেন নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দেখা যায় মেয়ে ঝুমপু অসুস্থ অবস্থায় নার্সিংহোমের বেডে শায়িত। ঝুমপুকে সুস্থ করতে তার শরীরে অ্যামপিউল ওষুধ প্রয়োগে সকলেই যখন দ্বিধাগ্রস্থ। এমতাবস্থায় মেয়ে ঝুমপুকে বাঁচিয়ে রাখতে শুরু হয় ঋষির লড়াই। মেয়ের ব্যথা প্রশমিত করতে এক ঝুঁকিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করে ঋষি, যা নাট্যকার গদ্যসংলাপে ব্যক্ত করেছেন —

"ঝুমপু : বাবা তুমি আমার সব ব্যথা শেষ করে দাও, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।
ঋষি : দেব, তাই দেব।"[২৩]

তাই পিতা মেয়ের অসুস্থতার বেদনাকে সহ্য করতে না পেরে অ্যামপিউল ওষুধ ঝুমপুর শরীরে প্রয়োগ করে। ফলস্বরূপ ঝুমপু জ্ঞান হারায়। ঝুমপুর এমন অবস্থায় পিতা ঋষি তার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন ড. দেবকে, যা নাট্যকার অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে নাটকে প্রয়োগ করেছেন-

"স্যার, আমি এবারে সত্যি হেরে গেলাম। ভেবেছিলাম বিজ্ঞানের জন্য, জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য আমি সব কিছু সহ্য করতে পারব। এমনকি ঝুমপু যদি চলে যায় তাও ভাববো যে আমি শেষ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি পারছি না, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।"[২৪]

মৃত্যুরূপী যুবতীর সঙ্গে প্রাণের প্রহরী ঋষির প্রতিযোগিতায় জীবনেরই জয় হয়। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে টানটান উত্তেজনায় ঝুমপু বেঁচে ওঠে। তাই ঋষি আত্মপ্রত্যয়ে বলতেই পারে —

"আমি জীবনের দিকে। আমি সব সময় জীবনের দিকে।"[২৫]

'প্রাণের প্রহরী' গদ্যনাটক নির্মাণে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন মিশ্র ভাষার সংলাপ। যেমন— ইংরেজিতে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ'। আবার ব্যবহার করেছেন একাধিক অনুকার শব্দ। যেমন— চা-টা, টাকা-ফাকা এর মত বিভিন্ন শব্দ। ব্যবহৃত হয়েছে শ্লেষ বাক্য প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রুগির আত্মীয়ের কথায় —

"মেয়ে মানুষের পেট কাটতে হয় তা বুঝি, কিন্তু পুরুষ মানুষের যখন তখন পেট কাটা মোটেই কাজের কথা নয়।"[২৬]

নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাবলীল গদ্যভাষার মাধ্যমে নাটকটিকে নাটকীয়তায় পর্যবসিত করেছেন।

কাব্যনাটক হিসাবে 'প্রাণের প্রহরী'তে দৃশ্য সংখ্যা দুটি। চরিত্রের সংখ্যা আট। কিন্তু অন্যদিকে গদ্যনাটক হিসাবে 'প্রাণের প্রহরী'তে দুটি অঙ্ক সহ এগারোটি দৃশ্যে সমন্বিত। চরিত্রের সংখ্যা ছাব্বিশটি। তবে নাট্যকার কাব্যনাটকের শুরুতেই যেভাবে চমকপ্রদ সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা গদ্যনাটকে ম্লান। যেমন- কাব্যনাটকের শুরুতে ডাক্তার ঋষির গলার আওয়াজ শোনা যায় —

"ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা কি?"[২৭]

অন্যদিকে গদ্যনাটকে শুরু হয়েছে এইরূপে —

"অতিন : বল তো, কোন গান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি লোক গায়?[২৮]

বোঝা যায় নাট্যকার সচেতনতার সঙ্গেই কাব্যনাট্য ও গদ্যনাট্যের প্রভেদ অনুযায়ী সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কাব্যনাট্য 'প্রাণের প্রহরী'র 'মৃত্যু' চরিত্রটি গদ্যনাটকে 'যুবতী' চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন নাট্যকার। 'মৃত্যু' ও 'যুবতী'র ব্যবহৃত একই সংলাপের দ্বারা নাট্যকারের সংলাপ প্রয়োগের দক্ষতা আরও স্পষ্টকৃতভাবে অনুধাবন করা যায়। কাব্যনাটকে যেমন-

> "মৃত্যু : আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী
> আমি তমসার মধ্যে দিয়ে ওর হাত ধরে
> নিয়ে যাব।"[২৯]

অন্যদিকে গদ্যনাটকে —

> "যুবতী : আমি এই শিশুটির অনন্তকালের ধাত্রী। আমি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ওর হাত ধরে নিয়ে যাব। ওকে আমার কাছে দাও।"[৩০]

উপলব্ধি করা যায় প্রথমটি কাব্যের মাধুর্যে পূর্ণ। অন্যদিকে গদ্যনাটকের সংলাপটি সাবলীল গদ্যে রচিত।

'প্রাণের প্রহরী' কাব্যনাটক ও 'প্রাণের প্রহরী' গদ্যনাটকের মধ্যে নানাবিধ পরিবর্তন করেছেন। সংযোজন করেছেন একাধিক চরিত্র ও উপকাহিনি, যা গদ্যনাটকে নাট্যকারেরা অনায়াসেই করতে পারেন। উদ্দেশ্য একটাই নাটককে পূর্ণাঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা। যেমন— ঋষির স্ত্রী প্রতিমা, ড. আমেদ, ড. অজিত, ড. দেব, চন্দনা প্রভৃতি চরিত্র। 'প্রাণের প্রহরী' কাব্যনাটকের প্রতীক চরিত্রটি পরিবর্তিত হয়ে গদ্যনাটকে এসেছে অতীন চরিত্র রূপে। আবার কাব্যনাটকে যেখানে ঋষির ছেলে বাবলুর কথা বলা হয়েছে গদ্যনাটকটিতে নাট্যকার পরিবর্তন করে কন্যা ঝুমপু চরিত্রটি এনেছেন। তেমনই নাট্যকার উপকাহিনির মধ্যে এনেছেন— অতীন, সংবরণ ও অতীনের স্ত্রী আলোকে নিয়ে একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। আছে সোনারপুরের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ভণ্ড সন্ন্যাসী অঘোর বাবার আখ্যান। এসেছে ঋষি ও প্রমিতার দাম্পত্য জীবনের ছবি, উক্ত এই উপকাহিনিগুলির মধ্যে একমাত্র অঘোর বাবার আখ্যানটি নাটকের মূল কাহিনির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। বাকি কাহিনিগুলি মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তাই বললে অত্যুক্তি হবে না যে প্লট গঠনে সুনীল ব্যর্থ। অন্যদিকে তিনি কাব্যনাট্যে অনেক বেশি সংযত ও কাহিনিকে সঠিক রূপায়ণ করতে পেরেছেন। আসলে তিনি কাব্যনাটকে মূল কাহিনিকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তার পিছনে কাজ করেছে তাঁর কবিসত্তা।

বিশ শতকের পাঁচের দশকের একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, লিখেছেন অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ এমনকি ভ্রমণকাহিনি। এছাড়াও তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও একজন প্রখ্যাত নাট্যকার হিসাবে পরিচিত। তবে নাট্যকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন নাটক যেহেতু মঞ্চের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাই মঞ্চজ্ঞান না থাকলে সঠিক ভাবে নাটক লেখা যাবে না। এই সত্যটি তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন 'প্রাণের প্রহরী'র পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপের অভিনয় করতে গিয়ে —

> "প্রাণের প্রহরী মঞ্চস্থ করতে গিয়ে দেখি, পদে পদে ভুল করেছি দৃশ্য বিভাজন ঠিক হয়নি।"[৩১]

ফলস্বরূপ পরবর্তী নাটকগুলিতে তিনি ভুল ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। তবে ঔপন্যাসিকের স্বাভাবিক প্রবণতা তাঁর নাট্য রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। নাটকগুলি কাহিনিগত দিক থেকে হয়ে উঠেছে বিবৃতিধর্মী গল্পের ন্যায়। নাটকগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও নাট্যকারের অযত্নের ছাপ রয়েছে বলে মনে হয়। বলাবাহুল্য যে, কবি বুদ্ধদেব বসু কিংবা কবি রাম বসু প্রমুখেরা বাংলা কাব্যনাট্য সাহিত্যের ধারাকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একজন দক্ষ শিল্পী।

Reference:

১. ঘোষ, অজিত কুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ২য় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ১
২. রক্ষিত, মলয় ও কাজি তাজউদ্দিন, নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র, প্রবেশক, ২য় সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র, ২য় সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ৩৩
৪. তদেব, পৃ. ৫৩
৫. তদেব, পৃ. ২২৩
৬. তদেব, পৃ. ২৯৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. তদেব, পৃ. ৩২৮
৮. তদেব, পৃ. ৩২৬
৯. তদেব, পৃ. ২৪৪
১০. তদেব, পৃ. ২৮৪
১১. রক্ষিত, মলয় ও কাজি তাজউদ্দিন, নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র, প্রবেশক, ২য় সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮
১২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র, ভূমিকা, ২য় সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮
১৩. মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর, নাট্যতত্ত্ব বিচার, ৪র্থ সং, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৩০৩
১৪. মুখোপাধ্যায়, তরুণ, কাব্যনাট্য বিভাবনা, ১ম সং, কলকাতা, সুপ্রিম পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃ. ১২৪
১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র, ২য় সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ১২
১৬. তদেব, পৃ. ২০
১৭. তদেব, পৃ. ২১
১৮. তদেব, পৃ. ২৩
১৯. তদেব, পৃ. ২৩
২০. মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর, নাট্যতত্ত্ব বিচার, ৪র্থ সং, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ২৯৮
২১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র, ২য় সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ৮২
২২. তদেব, পৃ. ১৩০
২৩. তদেব, পৃ. ১৩৫
২৪. তদেব, পৃ. ১৪০
২৫. তদেব, পৃ. ১৩৭
২৬. তদেব, পৃ. ৮৪
২৭. তদেব, পৃ. ১১
২৮. তদেব, পৃ. ৬৯
২৯. তদেব, পৃ. ২১
৩০. তদেব, পৃ. ১৩৬
৩১. রক্ষিত, মলয় ও কাজি তাজউদ্দিন, নাটক ও কাব্যনাটক সমগ্র, প্রবেশক, ২য় সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮